World Vision

ISSN: 2078-8460

Vol. 12 • No. 1 • June 2018

কোটচাঁদপুরের মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় পুরাকীর্তি: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

(Muslim and Hindu Religious Archeology of Kotchandpur: A Comparative Review)

মোঃ মতিয়ার রহমান*

Abstract

This article presents an enquiry, field observation and an analytical study about the religious antiquities of Kotchandpur. Kotchandpur is an upzila of Jhenaidah district of Bangladesh. It is 29 k.m. far from the district-headquarters. Administration Kotchandpur Thana was formed in 1772 and it was turned into an upazila in 1983. Municipality was formed in 1883. This ancient and traditional human habitation was an important business centre during the British colonial rule in India sub-continent. There were many Zamindars (Land lords) and rich businessmen from home and abroad in this locality. From many sources we get information of some temples, tombs, mosques, indigo-factory, sugar-factory, bridge, dispensary, municipality bhaban, schools, palace of Zamindars, rajas, indigo-businessmen and the houses of general people. Some antiquities are fully destroyed and some are partly destroyed. This article will suggest to take initiative of the preservation programs on the basis of insufficient resources, and in order to preserve all ancient structures and archaeologists. This study may be helpful in searching for more interesting information for archeological researchers and may help to reconstruct the history of this area.

Keywords: *archeology, religious antiquitie, temple, graveyards-architecture.*

ভূমিকাঃ

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হচ্ছে পুরোনো বা প্রাচীন স্থাপত্য ও পুরাকীর্তি, শিল্পকর্ম, মূর্তি, ভাস্কর্য, অলঙ্কার, প্রাচীন আমলের মুদ্রা বা মূল্যবান আসবাবপত্র। যা প্রাচীনকালের মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা, জীবনযাত্রা, সংস্কার, রুচি বা দৃষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দিয়ে থাকে। এসব প্রাচীন স্থাপত্য বা পুরাকীর্তিসমূহ ইতিহাসের অন্যতম জীবন্ত উৎসরূপে মূল্যায়িত হয়ে থাকে। বস্তুত, এর মাধ্যমেই একটি সমাজ, দেশ বা জাতির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিচয় ফুটে ওঠে। বাংলাদেশে অনেক পুরাকীর্তি আছে যেগুলো এখনো সুশীল সমাজের নজরে পড়েনি অথবা স্থাপত্যকলায় অভিজ্ঞ এবং ইতিহাস অনুসন্ধানে অনুরাগী গবেষকের সুনিবিড় পর্যবেক্ষণে আসেনি এবং গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর[১] উপজেলায় তেমনকিছু পুরাকীর্তিক নিদর্শন দেখা যায়।

* উপ-কীপার (চ.দা.), জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। E-mail: ziamuseum@gmail.com

জেলা-সদর থেকে প্রায় ২৯ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে এ উপজেলার অবস্থান। বিভিন্ন সূত্রে এ অঞ্চলে অনেক পুরাকীর্তির উল্লেখ থাকলেও সরেজমিন অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে, সেগুলোর অধিকাংশই ধ্বংশ হয়ে গেছে। আর যেগুলো টিকে আছে সেগুলো অযত্ন-অবহেলায় টিকে আছে। অথচ, আমাদের শিল্পকলা ও আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুর্ণগঠনে এগুলোর গুরূত্ব অপরিসীম। সেকারণে এগুলোর একটি স্থাপত্যিক বর্ণনা তুলে ধরা আবশ্যক বলে মনে করছি। আলোচ্য প্রবন্ধে সরেজমিনে অনুসন্ধান করে গবেষণাভূক্ত অঞ্চলে জ্ঞাত প্রতিটি পুরাকীর্তিস্থল পর্যবেক্ষণ করে একটি স্থাপত্যিক বর্ণনা এবং এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক গুরূত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুর একটি পুরাতন উপজেলা যা ১৭৭২ সালে থানা হিসাবে গঠিত হয়। এর নামের উৎপত্তি সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছুই জানা যায়নি। প্রচলিত আছে অতীতে চাঁদ খান নামে এক ধার্মিক ব্যক্তি ইসলাম প্রচারের জন্যে বসতি স্থাপন করেন। ধার্মিক ব্যক্তির বাড়ির চারপাশে শহরের মত গড়ে ওঠে। সম্রাট জাহাঙ্গীর এর আমলে বিদ্রোহী বারো ভুঁইয়া থেকে রক্ষা করার জন্য একটি দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছিল। ফার্সি ভাষায় দেয়ালকে কোট বলা হয়। ধারণা করা হয় কোটচাঁদপুর নামের উৎপত্তি কোট এবং চাঁদ খান এই দুইটি শব্দ থেকে। যা হোক, এখানকার ধর্মীয় পুরাকীর্তিকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা:

১. মুসলিম-ধর্মীয় পুরাকীর্তি

২. হিন্দু-ধর্মীয় পুরাকীর্তি

১. মুসলিম ধর্মীয় পুরাকীর্তিঃ

কোটচাঁদপুর একটি প্রাচীন জনপদ। প্রাচীনকাল হতে এটি হিন্দু-প্রধান অঞ্চল হিসেবে পরিচিত থাকলেও বর্তমানে সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে এবং এটা এখন একটি মুসলিম-প্রধান অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

এ উপজেলায় বর্তমানে ৮৮.২৯ শতাংশ[২] মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তবে, মুসলিম পুরাকীর্তির দিক দিয়ে কোটচাঁদপুর খুব একটা সমৃদ্ধ নয়। সরেজমিনে অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে, এ অঞ্চলে মুসলিম ধর্মীয় পুরাকীর্তির নিদর্শন খুবই কম এবং বাংলার সুলতানী বা মুঘল আমলে নির্মিত ধর্মীয় পুরাকীর্তির কোনো নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়নি। এ অঞ্চলে জ্ঞাত মুসলিম ধর্মীয় পুরাকীর্তিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

যথা:

১.১. মসজিদ

১.২. সমাধি

১.১ মসজিদঃ

বাংলাদেশে মুসলিম পুরাকীর্তির সমৃদ্ধ ক্ষেত্র হলো মসজিদ-স্থাপত্য। বর্তমানে কোটচাঁদপুরে ২২৫ টি[৩] মসজিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন মসজিদ তেমন একটা দেখা যায়না। নগদাগ্রাম জামে মসজিদ (১৮৮৪ খ্রি.) এবং বড়বামনদাহ জামে মসজিদ (১৮৮৫ খ্রি.) দু'টিকে এ অঞ্চলের পুরোনো মসজিদ বলে একটি সূত্রে [৪] উল্লেখ করা হয়েছে। সরেজমিন অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে, এগুলোর স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মত নয়। কারণ,অতি সাম্প্রতিককালে সাধারণভাবে এগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলোতে নিম্নমানের নির্মাণ উপকরণ ব্যাবহার করা হয়েছে, অলঙ্করণে জাঁকজমকতা নেই এবং নির্মাণে শৈল্পিক রীতির বেশ অভাব থাকায় পুরাকীর্তির আলোচনায় এগুলো গুরূত্ব বহন করে বলে মনে হয়না।

১.২. সমাধিঃ

সমাধি-স্থাপত্য মুসলিম স্থাপত্যের অন্যতম অঙ্গ। সমগ্র কোটচাঁদপুরে কয়েকটি প্রাচীন সমাধির সন্ধান পাওয়া যায়।

১.২.১. চাঁদখার সমাধিঃ

চাঁদখার সমাধি কোটচাঁদপুরের অন্যতম প্রাচীন সমাধি। কোটচাঁদপুর থানার সামনেই এর অবস্থন। ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে সমাধিটি প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫] সমাধিটি অনুচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত থাকলেও পুরোনো স্থাপত্যের কোনো নিদর্শন আর বিদ্যমান নেই এবং আধুনিককালে অত্যন্ত সাদামাটাভাবে এখানে ইমারত নির্মাণ করে কবরটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চাঁদখা সম্পর্কে নানা মত প্রচলিত আছে। কারো কারো মতে তাঁর নাম সরদার চাঁদ সাহা এবং তিনি হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাদের মতে এখানে সরদার চাঁদখার আখড়া ছিল। উল্লেখ্য, 'আখড়া' কাথাটির সাথে বাংলার বাউল সম্প্রদায়ের একটা যোগাযোগ আছে। সে হিসেবে চাঁদশাহ'র সাথে বাউলদের যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে। মুসলমানদের অভিমতে চাঁদশাহ একজন মুসলিম ছিলেন এবং ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি আফগানিস্তানের মানপুরা হতে এ অঞ্চলে আগমণ করেন এবং এ এলাকার অনেক হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বিদেরকে ইসলাম ধর্মে দিক্ষীত করেছিলেন।[৬]

১.২.২. জালালপুর সমাধিঃ

এ অঞ্চলের সমাধি স্থাপত্যের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র নিদর্শন হল জালালপুর সমাধি। কোটচাঁদপুর উপজেলা-সদর হতে প্রায় ১০ কি.মি. উত্তরে জালালপুর গ্রামে এটি অবস্থিত। জায়গাটি বর্তমানে ফুলমিয়ার দরগাহ বলে বহুল পরিচিত। এখানে ফুলমিয়ার কবর আছে বলে অনেকের ধারণা। তবে এর নির্মাতা বা নির্মাণ তারিখ সঠিকভাবে জানা যায়না। ফুলমিয়া[৭] নামক জনৈক দরবেশ এটা নির্মাণ করেছিলেন বলে লোকমুখে শোনা যায়। এর স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, সমাধিটি বৃটিশ আমলের শেষের দিকে নির্মিত হয়ে থাকতে পারে। বর্গাকারে নির্মিত এই সমাধির বাহ্যিক পরিমাপ ১১/১১ ফুট এবং অভ্যন্তরীণ পরিমাপ ৭.১১/৭.১১ ফুট । দেওয়াল ২ ফুট প্রশস্ত। নির্মাণে চুন-সুরকী এবং পোড়ানো ইটের ব্যাবহার করা হয়েছে। ইটের পরিমাপ সাধারণত ১০/৫ ফুট। এর কার্ণিশ সমান্তরাল এবং প্রতিকোণে কার্ণিশের সাথে সমান্তরাল করে বুরুজ (Corner turret) নির্মাণ করা হয়েছে, যেগুলো উপরের দিকে ক্রমশ সামান্য সরু (Tappering)। উপরের দিকে ক্রমশ সরু করে বুরুজ বা দেওয়াল নির্মাণ করার এই রীতি দিলিণ্ঢর তুঘলক স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অর্ধগোলায়িত গম্বুজ দ্বারা আবৃত এই সমাধির গম্বুজশীর্ষে ফিনিয়েল হিসেবে লোহার দন্ড শোভা পাচ্ছে। লৌহ দন্ডের মাথায় এক সময় হয়ত পদ্মকুঁড়ি নকশা শোভা পেত, যা মুঘল স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এখন সেটা দেখা যায়না। গম্বুজ সরাসরি দেওয়াল প্রাকারের উপর নির্মিত এবং গম্বুজটি হাল আমলে কংক্রিটের দ্বারা নির্মিত। বর্গাকার এই ইমারতের চারকোণর ত্রিকোণাকার ভূমি পান্দান্তিফ (Pendentive) আকারে ভরাট করা হয়েছে। পূর্ব ও দক্ষিণ দেওয়ালের মাঝখানে ২'.২" প্রশস্ড় একটি করে প্রবেশদ্বার আছে। উত্তরদিকের প্রবেশপথটি বন্ধ। প্রবেশদ্বার আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে নির্মিত এবং এখানে খিলান ও সর্দলের ব্যবহর করা হয়েছে। এর খিলান দ্বি-বলয় আকারের এবং ভূসোঁয়া (Voussoir) পদ্ধতিতে নির্মিত। প্রবেশদ্বারের পার্শ্ববর্তী সরু কৌণিক স্তম্ভশীর্ষ হতে খিলান উত্থিত। অভ্যন্তরে পশ্চিম দেওয়ালে একটি অগভীর কুলুঙ্গি প্যানেল আছে।

মাযারটি পলেস্তারায় আবৃত এবং অলঙ্করণে জাঁকজমকতা নেই। অলঙ্করণ বলতে কেবল পান্দান্তিফের নিম্নাংশের মোচাকৃতির নকশা (Conical design) চোখে পড়ে। এছাড়া প্রবেশদ্বারের আয়তাকার ফ্রেম ও কোণদন্ড এবং প্রতিকোণের বুরুজ এ সমাধিটির সৌন্দর্য্য কিছুটা বৃদ্ধি করেছে। এর অভ্যন্তরের পান্দান্ডিফের নিম্নাংশে ব্যবহৃত মোচাকৃতির (Conical design) নকশা কোটচাঁদপুরের পার্শ্ববর্তী মহেশপুর উপজেলা এবং চৌগাছা উপজেলার হিন্দু ও মুসলিম উভয় স্থাপত্যেও দেখা যায়। এক্ষেত্রে মহেশপুরের তিনজোড়া শিবমন্দির[৮],ধানহাড়িয়া শাহী মসজিদ[৯] ও চৌগাছা উপজেলার স্বরুপপুর গ্রামের মধ্যস্থিত একরত্ন মন্দির[১০] এবং ঢাকা শহরে নির্মিত ঢাকেশ্বরী মন্দির[১১] উল্লেখযোগ্য। এ নকশাটি একান্তই দেশজ এবং স্থানীয় কারিগরেরা তাদের অতি পরিচিত কলাগাছের মোচার নকশার অনুকরণে এটি নির্মাণ করে থাকতে পারে।[১২] সমাধির প্রতিকোণে কার্ণিশের সমান্তরাল করে যে বুরুজ নির্মাণ করা হয়েছে তাতে বাংলার সুলতানী স্থাপত্যের প্রভাব আছে বলা যায়।

১.২.৩. ফকির বেশাবের শাহ'র সমাধিঃ

কোটচাঁদপুর রেলওয়ে স্টেশনের সামান্য পশ্চিমে কোটচাঁদপুর খাদ্য গুদামের নিকটে একটি অনুচ্চবেদী আছে এবং এটাকে ফকির বেশাবের শাহ'র কবর বলা হয়।[১৩] তবে এখানে পুরনো ইমারতের কোনকিছুই টিকে নেই। একটি অনুচ্চ বেদী এর স্মৃতি বহন করছে। বেদীর উপর তিনটি কলস উপুড় করে বসানো আছে। ফকির বেশাবের শাহ সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায়না।

১.২.৪. কানাই শাহ'র সমাধিঃ

কানাই শাহ'র সমাধি[১৪] কোটচাঁদপুরের অন্যতম ধর্মীয় পুরাকীর্তি। কোটচাঁদপুর মেইন বাসস্ট্যান্ড হতে ঝিনাইদহের উদ্দেশ্যে যে রাস্তা চলে গেছে তার ৬-৭ কি.মি. দুরে বলুহর ইউনিয়নের ফুলবাড়ি ওয়ার্ডে, কুশনা বাওড়ের দক্ষিণে এর অবস্থান। প্রায় দেড় বিঘা জায়গা জুড়ে সমাধি এলাকাটি গড়ে উঠেছে। কানাই শাহ্ কোথা থেকে আসেন সে সম্পর্কে জানা যায়না। মাযারের বর্তমান খাদেম মো. আব্দুল ওহাব শিকদারের (৮৫) মতে এটা আলম শাহ্'র সমাধি এবং তিনি বাংলার বাইরের কোনো লোক ছিলেননা বলেও তিনি মন্তব্য করেন। বাঁধানো কবরটি একটি সাদামাটা টিনশেডের ঘরের মধ্যে অবস্থিত। মাযারে কোনো শিলালিপি না থাকায় এর সঠিক নির্মাতা এবং নির্মাণ তারিখ সর্ম্পকে কিছুই জানা না গেলেও সমাধিটি আনুমানিক ২৫০ বছরের পুরোনো বলে জনশ্রুতি আছে। তবে সমাধিতে ব্যবহৃত উপাদন বিশেণ্ডষণ করলে একে ততোটা প্রাচীন বলে মনে হয়না বরং ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। সমাধির প্রায় এক'শ হাত উত্তরে আর একটি বাঁধানো কবর আছে। খাদেমের মতে এটা কানাই শাহ'র শিষ্য বুদো শাহ'র কবর। লোকজন এখানে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মানত করে। বর্তমানে কোটচাঁদপুরের সলেমানপুর ওয়াক্ফ এস্টেটের স্বত্ব দখলীয় এই দরগার জমির মালিক হলেন- মুতাওয়াল্লী আবু তালেব মো. মুসা।[১৫]

১.২.৫. গাজীকালু-চম্পাবতির সমাধিঃ

গাজীকালু-চম্পাবতী উপাখ্যান মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। কোটচাঁদপুরের পুরাকীর্তির আলোচনায় গাজীকালু-চম্পাবতির পরিচয় নতুন করে প্রদান করা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কারণ, ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বারবাজারে তাদের কবর আছে বলে হাল আমলে সংস্কার করে চিহ্নিত করা হয়েছে।[১৬] তবে কোটচাঁদপুরের বলরামপুর (প্রাচীন বলরামনগর) জয়দিয়া বাওড়ের ধারে তাদের কবর ছিল বলে জানা যায়।[১৭] কিন্তু, যে জায়গায় তাদের কবর ছিল বলে লোকজন মনে করেন, সরেজমিনে অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে, সেখানে পুরোনো ইমারতের কোনো কিছুই টিকে নেই। সেখানে একটি ঢিবি আছে এবং ঢিবির উপর একটি বটবৃক্ষ আছে।

চিত্র: গাজীকালু-চম্পাবতী সমাধি

মত দ্বৈততা থাকলেও এটা প্রতিষ্টিত সত্য যে, গাজী-কালু ও চম্পাবতীর সমাধি বারবাজারেই অবস্থিত। গাজী-কালু ও চম্পাবতীর পরিচয় নিয়ে আছে নানা কিংবদন্দী। জনশ্রুততিতে পাওয়া যায় বিরাট নগরের শাসক দরবেশ শাহ্ সিকান্দারের পুত্র গাজী। কালু সিকান্দারের পোষ্য পুত্র। কালু গাজীকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং সর্বত্র তাকে অনুসরণ করতেন। গাজীর সাথে ছাপাই নগরের সামন্ত রাজা রামচন্দ্র ওরফে মুকুট রাজার মেয়ে চম্পাবতীর দেখা হয়। গাজী ভুলে গেলেন তিনি মুসলমান, চম্পাবতীও ভুলে গেলেনে তিনি হিন্দু রাজার মেয়ে। তাদেও মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠলো। তাদেও মিলনের মাঝে দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়াল সামাজিক ও ধর্মীয় বাঁধা। রাজা তাঁর সেনাপতিদের হুকুম দিলেন গাজী ও কালুকে শায়েস্তা করতে। ঘোর যুদ্ধে মুকুট রায়ের সেনাপতি দক্ষিণা রায় পরাজিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কওে গাজীর অনুসারী হয়। গাজী-কালু ও চম্পাবতীর সমাধির সাথে দক্ষিনা রায়ের সমাধি আছে।

২. হিন্দু-ধর্মীয় পুরাকীর্তিঃ

একসময় কোটচাঁদপুর ছিল হিন্দু-প্রধান অঞ্চল। তবে কালের বিবর্তনে সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হলে এ অঞ্চলের হিন্দুদের আধিপত্য অনেকটাই খর্ব হয়ে যায়। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ এবং ১৯৫০ সালের জমিদারী প্রথা বাতিল হলে হিন্দুসম্প্রদায়ের অনেকেই ভারতে পাড়ি জমায়। ফলে এ জনপদে হিন্দুদের হার কমতে থাকে। বর্তমানে এ অঞ্চলে প্রায় ১১.৭০ শতাংশ[১৮] মানুষ হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত। তাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে তাদের ধর্মীয় স্থাপত্য নির্মাণেও এর প্রভাব পড়েছে।

কোটচাঁদপুরের হিন্দু-ধর্মীয় পুরাকীর্তির প্রধান অঙ্গ হল-মন্দির। হিন্দু-প্রধান অঞ্চল থাকার কারণে এ অঞ্চলে অনেক পুরোনো মন্দির, আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বর্তমানে ২০টি মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায় বলে একটি সূত্রে[১৯] উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সরাসরি ক্ষেত্র অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, কিছু কিছু মন্দির অনেক পুরোনো বলে জনশ্রুতি থাকলেও পুরোনো ইমারতের কোনো চিহ্ন বিদ্যমান নেই; বরং সেখানে নতুন করে অতি সাধারণভাবে মন্দির তৈরী করা হয়েছে এবং এগুলোতে নিম্নমানের উপাদানের ব্যবহার, অলঙ্করণের অনুপস্থিতি এবং শৈল্পিক গঠণশৈলীর অভাবের কারণে পুরাকীর্তির আলোচনায় সেগুলো খুব একটা গুরুত্ব বহন করে বলে মনে হয়না। তবে কয়েকটি মন্দির শিল্পগুণে সমৃদ্ধ। নিম্নে এতদাঞ্চলে জ্ঞাত হিন্দু-ধর্মীয় পুরাকীর্তির বর্ণনা তুলে ধরা হল।

২.১. ইকড়ার আশ্রম মন্দিরঃ

ইকড়ার আশ্রম মন্দির এ অঞ্চলের হিন্দু-ধর্মীয় পুরাকীর্তির বিদ্যমান অন্যতম নিদর্শন। কোটচাঁদপুর কলেজ বাসস্ট্যান্ড হতে প্রায় ১০ কি.মি. উত্তর-পূর্বে, কুশনা ইউনিয়নের ইকড়া গ্রামের ইকড়া-তালিন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামান্য দক্ষিণ-পূর্বে এর অবস্থান। প্রায় ১১ বিঘা জায়গার[২০] উপর গড়ে ওঠা আশ্রমের উত্তর দিক দিয়ে বয়ে চলেছে চিত্রা নদী। দৈনন্দিন জীবনে পানির ব্যবহারজনিত চাহিদা এবং যোগাযোগের সহজ মাধ্যম হিসেবে প্রাচীন যুগ এবং মধ্যযুগে নদীর পাশে শহর নগর এবং ধর্মোপাশনালয় গড়ে উঠতে দেখা যায়। এখানে পাশাপাশি তিনটি মন্দির থাকলেও উত্তর পাশেরটি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সেখানে একটি নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে টিকে থাকা মন্দির দু'টি পাশাপাশি অবস্থিত। উত্তর পাশেরটি অন্যটি থেকে তুলনামূলকভাবে বড়। যে মন্দিরের ছাদ শিখর বা পিরামিড আকৃতিতে নির্মিত তাকে সাধারণত রত্নমন্দির বলে।[২১] সে হিসেবে এ মন্দিরের ছাদ একটিমাত্র শিখর আকৃতিতে নির্মিত হওয়ায় একে আমরা একরত্ন মন্দির বলতে পারি।

অষ্টভূজ আকারের প্রায় ২ ফুট উচ্চতাসম্পন্ন ভিত্তিবেদীর উপর মন্দিরদু'টি অষ্টভূজ আকারে নির্মিত। বৃহৎ মন্দিরের প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্য ৬.১ ফুট। ভিত হতে ফিনিয়েল পর্যন্ড় উচ্চতা প্রায় ৪০ ফুট। প্রতিবাহুতে আয়তাকার ফ্রেম সৃষ্টি করা হয়েছে। ফ্রেমের উপরের বদ্ধ খিলান অনেকটা সিগমেন্টাল (Segmental) আকারে নির্মাণ করা হয়েছে। প্রায় ২৫ ফুট উপর থেকে ক্রমশ ঢালু হয়ে ছাদ উপরের দিকে উঠে শিখর আকৃতি ধারণ করেছে। ক্রমপ্রলম্বন (Corbelling) পদ্ধতিতে নির্মিত এই শিখরের নির্মাণ ইটের নির্মিত ব্রাকেটের উপর হতে শুরু হয়েছে এবং শিখরশীর্ষে ফিনিয়েল হিসেবে ৪টি কলস মোটিফ শোভা পাচ্ছে। পূর্ব বাহুতে ২.১১ ফুট প্রশস্ড় ও ৬ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি প্রবেশপথ আছে। সর্দল ও খিলানের সমন্বয়ে প্রবেশপথ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রবেশদ্বারের পার্শবর্তী কৌণিক কোণদন্ড হতে খিলান উত্থিত এবং এ খিলান অনেকটা ইউরোপীয় সিগমেন্টাল আকারে নির্মিত। এর নির্মাণে চুন-শুরকি ব্যবহার করা হয়েছে। ইটের পরিমাপ সাধারণত ১০/৫ ইঞ্চি। ইটের এমন পরিমাপ পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, মন্দিরটি বৃটিশ আমলে নির্মত হয়ে থাকতে পারে।

এ মন্দিরে খুব একটা অলঙ্করণ করা হয়নি। তবে প্রতিবাহুর প্যানেল ও প্যানেলের উপরে ইটের নির্মিত ব্রাকেট, ক্রম সরু শিখর, কলস-মোটিফ সমৃদ্ধ ফিনিয়েল এবং সর্বোপরি এর বিশালত্ব একে সৌন্দর্য্যমন্ডিত করেছে।

ক্ষুদ্র মন্দিরটিও সম উচ্চতাসম্পন্ন অষ্টবাহু বিশিষ্ট ভিত্তিবেদীর উপরে নির্মিত। এর নির্মাণেও পোড়ানো ইট ও চুন-শুরকির ব্যবহার করা হয়েছে। এর প্রতিবাহুর পরিমাপ ৪.৪ ফুট এবং এখানেও আয়তাকার প্যানেল এবং এই প্যানেলের মধ্যে আবার ত্রিখাঁজবিশিষ্ট খিলান-প্যানেল তৈরী করা হয়েছে। এই খিলান কিছুটা ওজি (Ogee) আকৃতির। পূর্ববাহুতে ১.১০ ফুট প্রশস্ড় এবং ৫ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন প্রবেশপথ আছে এবং এর গঠণ প্রায় বৃহৎ মন্দিরের প্রবেশপথের অনুরূপ। এর ছাদ ক্রমপ্রলম্বন (Corbelling) পদ্ধতির প্রয়োগ করে শিখর আকৃতিতে নির্মাণ করা হয়েছে এবং এটা দেখতে অনেকটা মেলানো ছাঁতার মত। ইটের ব্রাকেটের উপর হতে শিখর নির্মাণ শুরু হয়েছে। এর শীর্ষেও কলস মোটিফ ছিল, কিন্তু তা ভেঙ্গে পড়েছে। এর শিখরে চুন-শুরকির প্রলেপ দিয়ে গম্বুজপৃষ্ঠ মসৃন করা হয়েছে, যাতে দ্রুত বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পড়তে পারে।

২.২. ভবানন্দ সেবা আশ্রম ও মন্দিরঃ

কোটচাঁদপুরের অন্যতম ধর্মীয় পুরাকীর্তি হল ভবানন্দ সেবা আশ্রম ও মন্দির। কুশনা ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডের ঘাঘা গ্রামে এর অবস্থান। প্রায় চার'শ বছরের পুরোনো এই আশ্রমটি ১৩ বিঘা জায়গাজুড়ে প্রতিষ্ঠিত। এ অঞ্চলের তদানীন্তন জমিদারপুত্র শ্রী ভবানন্দ জমিদারী দেখাশোনা অপেক্ষা নিজেকে ধর্মকর্মে নিয়োজিত করেছিলেন এবং তিনি এই আশ্রমটি গড়ে তোলেন। এখানে একটি শিবমন্দির এবং কালী মায়ের থান আছে। মন্দির ও থান সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রকান্ড বটবৃক্ষ। শিকড়ে এখনো ইট জড়িয়ে আছে এবং ভিতের চিহ্ন এখনো বিদ্যমান। ভিতের পরিমাপ প্রায় ২০/২৫ ফুট। ইটের পুরত্ব প্রায় ২ ইঞ্চি। এখানে এখনো পোড়ামাটি ও পাথরের তৈজসপত্র এবং মূর্তির ভাঙা টুকরো দেখা যায়। আশ্রমটির বেশ পরিচিতি আছে এবং এখনো ভারত এবং দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ধর্মপ্রাণ লোকজন যজ্ঞ-অনুষ্ঠান উপলক্ষে এখানে আগমন করেন। ভগ্নমন্দিরের প্রায় পঞ্চাশ হাত পশ্চিমে একটি টিনশেডের ঘরের মধ্যে ভবেশ, সত্য ও ক্ষেপু এবং যামিনী নামে চারজন সেবায়েতের সমাধি আছে।

২.৩. রথখোলা মন্দিরঃ

রথখোলা মন্দির কোটচাঁদপুরের অন্যতম প্রাচীন মন্দির। সলেমানপুর সাহপাড়ায় ১৭ শতকে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছিল[২২]। তবে, বর্তমান ইমারতটি বৃটিশ স্থাপত্যের আদর্শে নির্মিত হওয়ায় এটা বৃটিশ আমলের শেষের দিকে নির্মাণ করা অথবা পুরোনো মন্দির সংস্কার করে বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। বর্গাকার এই মন্দিরের প্রতিবাহুর দৈর্ঘ ২১.৭ ফুট। এর নির্মাণে চুন-শুরকি ও পোড়ানো ইটের ব্যবহার করা হয়েছেসামনের দিকে ত্রিখিলানবিশিষ্ট প্রবেশপথ রয়েছে। অর্ধগোলায়িত এবং ভূসোঁয়া পদ্ধতিতে নির্মিত এই খিলান গোলাকার জোড়া স্তম্ভশীর্ষ হতে উত্থিত। এর কার্ণিশ সমান্তরাল এবং কড়ি-বর্গার উপর পোড়ানো টালির ছাদ দ্বারা একে আবৃত করা হয়েছে। সামনের কার্ণিশের উপরে ডানাযুক্ত উপবিষ্ট গৌরপাখির প্রতিমূর্তি শোভা পাচ্ছে এবং তার মুখে শঙ্খ। মন্দির-অভ্যন্তরে শতাব্দীরও অধিক পুরোনো কাঠের প্রতিমা রয়েছে। এছাড়া এখানে একটি শতাব্দী-প্রাচীন কাঠের রথ আছে।

চিত্র: রথখোলা মন্দির

২.৪. শিববাড়ি মন্দিরঃ

শিববাড়ি মন্দিরটি কোটচাঁদপুরের সলেমানপুর হালদার পাড়ায় অবস্থিত। ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছিল।[২৩] তবে পুরোনো ইমারত ভেঙে গেলে নতুন করে বর্তমান ইমারতটি নির্মাণ করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। কারণ, মন্দিরের দেওয়ালে একটি আধুনিক বাংলা শিলালিপিতে লেখা আছে,

"কিশোর চন্দ্র শেখরের বতি: প্রতিক্ষন নংমম প্রসন্নকুমার দাস পিতৃদেব মহাশয়ের স্মৃতিসৌধ। স্মৃতিতিথি ১৩২৪/২০আষাড়, অমাবস্যা ১৩১৯/ ২৩শে পৌষ। দীন, শ্রীশচন্দ্রদাস, সলেমানপুর হালদারপাড়া।"

শিলালিপি হতে জানা যায় যে কোটচাঁদপুরের অন্যতম জমিদার শ্রী শ্রিশচন্দ্র দাস মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমানে কোটচাঁদপুর সলেমানপাড়ায় পচাঁমিয়ার (হুন্ডি কাজলের পিতা বলেও পরিচিত) যে বাড়ি টিকে আছে মূলত তা ছিল জমিদার শ্রী শ্রিশচন্দ্র দাসের। এই বাড়ির উত্তর দিকের বৈঠকখানার ছাদের নীচে কাঠের বর্গায় খোদায় করে বাড়িটির নির্মণ তারিখ ২৭ভাদ্র, ১৩০২ বলে উল্লেখ আছে। এ হিসেবে তিনি বাড়ি এবং উক্ত মন্দিরটি সমসাময়িক কালে নির্মাণ করেছিলেন বলা যায়। তাই ১৬৮০ খ্রি. এখানে মন্দির নির্মাণ করার কথা উল্লেখ থাকলেও বর্তমান মন্দিরটি ১৩০২ সাল মোতাবেক ঊনিশ শতকের শেষ দশকে নির্মাণ করা হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। বর্গাকার এ মন্দিরের প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্য ২৩.৮ ফুট। এর সামনের দিকে ত্রিখিলান বিশিষ্ট প্রবেশ পথ আছে এবংবৃটিশ স্থাপত্যের আদলে এই খিলান নির্মিত। কাঠের কড়ি বর্গার উপর পোড়ানো টালির ছাদ দ্বার মন্দিরটি আবৃত। মন্দিরে প্রায় তিন'শ বছরের প্রাচীন একটি পিতলের সিংহাসন আছে যা এ অঞ্চলের অন্যতম প্রত্নিনদর্শন।

২.৫. বলরামপুর শ্রীকৃষ্ণ বলরামদেব বিগ্রহ মন্দিরঃ

কোটচাঁপুর উপজেলার বলরামপুর গ্রামের জয়দিয়া বাওড়ের পূর্বপাড়ে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। হোসেনশাহী শাসনামলের সমসাময়িক (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রি.) রাজা মুকুট রায় এ মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন।[২৪] তবে তাঁর নির্মিত মন্দিরের কোনকিছুই টিকে নেই এবং এর ধ্বংসাবশেষের চিহ্নও নির্দিষ্ট করা যায়না।

২.৬. শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরঃ

কোটচাঁদপুর কালীবাড়ি রোডের পাশে অবস্থিত শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির বাংলা ১২৫৫ সালে নির্মিত।[২৫] তবে সরেজমিনে অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, এটি ১২০১ সালে নির্মিত বলে মন্দিরের নামফলকে লেখা আছে। এ মন্দিরটির কোন পুরাকীর্তিক নিদর্শন বিদ্যমান নেই। হাল আমলে নতুন করে ইমারত নির্মাণ করা হয়েছে।

২.৭. শ্রী শ্রী দূর্গা পুজামন্ডপঃ

শ্রী শ্রী দূর্গা পুজামন্ডপ বাংলা ১২৭০ সনে নির্মিত।[২৬] কোটচাঁদপুর কালীবাড়ি রোডের পাশে অবস্থিত শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের দক্ষিণপাশে এর অবস্থান। তবে এ মন্দিরেরও পুরোনো কোনো নিদর্শন বিদ্যমান নেই।

২.৮. সার্বজনিন দূর্গা পুজামন্ডপঃ

কোটচাঁদপুর উপজেলার সাফদারপুর ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডের ০৩ নং মৌজায় জয়দিয়া উত্তর হালদারপাড়ায় এই দূর্গাপুজামন্ডপ অবস্থিত। বর্তমানে এটি ষষ্টিতলা নামে পরিচিত এবং এখানে ষষ্টিপূজা করা হয়। এ গ্রামে বর্তমানে প্রায় দেড়'শ ঘর হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে- যাদের অধিকাংসই কুমোর সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রায় ২০০ বছর ধরে এখানে পুজো করা হয় বলে এলাকার লোকজন জানান। এখানে শতাব্দীরও অধিক পুরোনো একটি বটবৃক্ষ আছে এবং লোকজনের ভাষ্যমতে এই বটবৃক্ষের দু'টি অংশ- বট ও নাকড়। ছোট পাতা বিশিষ্ট বটকে নাকড় গাছ এবং বড়পাতা বিশিষ্ট বটকে বট গাছ বলে। এ এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে, এই বট এবং নাকড়ের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। লোকজন এখানে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মানত করে থাকে এখানে নতুন করে একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে।

২. ৯. কালীবাড়ি মন্দিরঃ

কোটচাঁদপুরের কুশনা ইউনিয়নের তালেশ্বর মৌজার ঘাঘা গ্রামে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। প্রায় ১২০ বছরের পুরোনো এই মন্দিরটিতে বৃটিশ আমলের নির্মাণশৈলীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। চুন-শুরকী এবং পোড়ানো ইট দ্বারা নির্মিত এই মন্দিরটি বারান্দা ও মূলঘর এ দু'ভাগে বিভক্ত । মূল ঘরের পরিমাপ বাইরের দিকে ২০/১৭ ফুট এবং বারান্দার পরিমাপ আভ্যন্ড়রে ৮/১৪ফুট। এর সামনে অর্ধগোলায়িত ত্রিখিলান বিশিষ্ট প্রবেশপথ আছে। এর খিলান ভূসোঁয়া পদ্ধতিতে ত্রিবলয় আকারে নির্মিত। প্রাথম বা নীম্ন বলয়ে কোন খাঁজ নেই, দ্বিতীয় বলয়ের খাঁজ উল্টানো মার্লন আকৃতির এবং উপরের বা তৃতীয় বলয় উত্তল আকৃতির নকশাকারে নির্মিত। এই খিলান ম্যধ্যবর্তী দু'টি বর্গাকারের (প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য দু'ফুট) স্ড়ম্ভ এবং বারান্দার পার্শ্ববর্তী দেওয়াল (দু'ফুট প্রশস্ত) হতে উত্থিত। বারান্দা হতে অভ্যন্ড়রে যাওয়ার জন্য কৌণিক আকৃতির একটি প্রবেশ পথ আছে। তবে এই খিলান সূক্ষাগ্র বিশিষ্ট নয়, বরং কিছুটা ওজি (Ogee) আকৃতির। এর কার্ণিশ সমান্ড়রাল এবং কড়ি-বর্গার উপর পোড়ানো টালির ছাদ দ্বারা আবৃত। মন্দিরের সামান্য দক্ষিণ-পশ্চিমে পোড়ানো ইট ও চুন-শুরকির নির্মিত একটি অগভীর কূপের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এখানে অলঙ্করণ করা হয়নি। মন্দিরের অভ্যন্ড়রে ছাদ হতে এক ফুট নীচে প্রায় এক ফুট প্রশস্ড় প্যানেলের মধ্যে এবং আভ্যন্ড়রীন প্রবেশ পথের খিলানমুখে পলেস্ড়রার ফুল-লতা-পাতার নকশা করা হয়েছে।

২.১০.মামুখালি কালী মন্দিরঃ

কোটচাঁদপুর উপজেলার এলাঙ্গী ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ড এবং ৭২ নং কাঠালিয়া মৌজায় প্রাচীন এ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে বর্তমানে কোনো চিহ্নমাত্র নেই এবং জায়গাটিতে বর্তমানে চাষাবাদ হচ্ছে। 'কালীতলার মাঠ' নামে পরিচিত জায়গাটি এখনো পুরোনো মন্দিরের স্মৃতি ধরে রেখছে। এ মন্দিরের জায়গা বর্তমানে কাঠালিয়া গ্রামের মৃত রাহাজউদ্দিনের পুত্র শহিদুল ইসলামের দখলে আছে।

২.১১. শ্রী শুভাষচন্দ্র সাহার মন্দিরঃ

বৃটিশ আমলে বাংলায় অনেক অভিজাত, ধনাঢ্য হিন্দু জমিদার, তালুকদারের বাড়িতে পারিবারিক মন্দির নির্মিত হতে দেখা যায়। তেমন একটি মন্দির হল শ্রী শুভাসচন্দ্র সাহার পারিবারিক মন্দির। কোটচাঁদপুর পৌরসভার ০৬ নং ওয়ার্ডের সলেমানপুর সাহপাড়ায় মন্দিরটি অবস্থিত। শ্রী শুভাষচন্দ্র সাহার পূর্বপুরুষ শ্রী বিষ্টুপদ সাহা ছিলেন ধনাঢ্য ব্যক্তি। ১৯ শতকের শেষেরদিকে বাড়ি এবং মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। বাড়ির সুদৃশ্য তোরণদ্বার হতে ভিতরে প্রবেশ করলেই বামদিকে মন্দিরটি দেখা যায়। বারান্দা এবং মূলঘর এ দু'ভাগে বিভক্ত এ মন্দিরের মূলঘরের পরিমাপ ভিতরের দিকে ১৫/ ২৭ ফুট। বারান্দা ২৫/১৮ ফুট। দেওয়াল ৩.৮ ফুট পুরু। নির্মাণ উপকরণ হিসেবে চুন শুরকি এবং পোড়ানো ইট ব্যবহার করা হয়েছে এবং ইটের পরিমাপ ১০/৫ ইঞ্চি। দক্ষিণমুখী এ মন্দিরে সামনের দিকে ত্রিখিলানবিশিষ্ট প্রবেশপথ আছে। খিলানপথটি একটি বৃহৎ আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে অবস্থিত এবং খিলান ত্রিবলয় আকারের বহুখাঁজবিশিষ্ট করে নির্মিত। খিলান মধ্যবর্তী দুটি গোলায়িত স্তম্ভ এবং দেওয়ালের সাথে সংযুক্ত দু'টি স্তম্ভ হতে উত্থিত। এখানকার স্তম্ভের গঠণলৈী অনন্য। মাঝখানে একটি বৃহৎ গোলায়িত খিলান এবং বৃহৎ খিলানের চারপাশে আছে ১২ টি সরু খিলান। স্তম্ভপদ বর্গাকার হলেও কোণগুলো দ্বিখাঁজবিশিষ্ট। মাঝে মাঝে লোহার পাত প্রবিষ্ট করে বৃহৎ খিলানের সাথে পার্শ্ববর্তী সরু খিলানসমূহকে পরস্পরে সংযুক্ত করে এর নির্মাণকে মযবুত করা হয়েছে। এ অঞ্চলে এরুপ স্তম্ভের নিদর্শন আর কোথাও দেখা যায়না। প্রতিটি খিলান আবার আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে নির্মিত। স্তম্ভের উপরিভাগে কয়েক ধাপে বহির্গত কার্ণিশ/ঠেকনা নির্মাণ করে এর উপর হতে খিলান নির্মাণ করা হয়েছে। খিলান ভুসোঁয়া পদ্ধতিতে নির্মিত এবং খিলানপটে (Tympanum) কাঠের জালিপর্দা আছে। বারান্দার খিলানপথের মতই মূলঘরে প্রবেশের খিলানপথ নির্মিত। মূল ঘরের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দু'টি বাটার ঘর আছে। পূজোর সামগ্রী এবং পুরোহিতের থাকার ঘর হিসেবে এই বাটার ঘর ব্যবহার করা হয়। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ একতলাবিশিষ্ট হলেও বাটার ঘর দ্বিতলবিশিষ্ট। বারান্দা এবং মূলঘর হতে বাটার ঘরে প্রবেশ করা যায়। বাটার ঘরের প্রবেশপথের গঠণ বেশ চমৎকার। অর্ধগোলায়িত খিলানবিশিষ্ট এই প্রবেশপথ পার্শ্ববর্তী গোলায়িত জোড়া স্তম্ভের উপর হতে উত্থিত। এখানকার খিলানপটে ত্রিভূজ আকৃতির নকশা করা হয়েছে। উপর তলার জানালার খিলানও প্রায় অনুরুপ।

মন্দিরের অভ্যন্তরে উত্তর দেওয়ালে দুটি কুলুঙ্গি আছে। কুলুঙ্গি একটি বৃহৎ খিলান আকৃতির ফ্রেমের মধ্যে ন্যস্ত। এই ফ্রেমের মধ্যে আবার খিলান আকৃতির ফ্রেম তৈরী করে সেই ফ্রেমের মধ্যে কুলুঙ্গি নির্মাণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ফ্রেমের খিলান ওজি (ogge) আকৃতির। এই খিলান বৌদ্ধদের চৈত্য গবাক্ষে ব্যবহৃত খিলান (কুদু) হতে আমদানীকৃত বলে মনে করা হয়।[২৭] এর কার্ণিশ সমান্তরাল ও বহির্গত এবং ইটের ব্রাকেটের উপর এই কার্ণিশ নির্মাণ করা হয়েছে। লোহার বর্গার উপর ইট বসিয়ে এর ছাদ নির্মাণ করা হয়েছে ।

এ মন্দিরের অলঙ্করণ শিল্পগুণে সমৃদ্ধ। সর্বত্রই পলেস্তারার অলঙ্করণ করা হয়েছে। সম্মুখ বারান্দার খিলান এবং অন্যান্য প্রবেশ পথের খিলানকে কেন্দ্র করে অলঙ্করণ করা হয়েছে। সম্মুখ প্রবেশপথের তিনটি খিলানের উপরাংশের আয়তাকার ফ্রেমের উপর প্রায় দুই ফুট উচ এবং ১৫ ফুট লম্বা একটি আয়তাকার প্যানেল তৈরী করা হয়েছে। এই প্যানেলকে আবার পলেস্তারার একটি স্ফীত রেখা দ্বারা দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। নীচের প্যানেলকে আবার দুটি প্যানেলে বিভক্ত করা হয়েছে। এই প্যানেলের সম্পূর্ণ অংশই আরব্য নকশায়, তথা ফুল-লতাপাতার নকশায় শোভিত। খিলানের শীর্ষে কলার মোচা বা লাটিমের মত নকশা করা হয়েছে। বাটার ঘরের প্রবেশপথের বাইরের খিলানপটে শিরাল নকশার অলঙ্করণ করে সূর্যের আলোকচ্ছটার চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। পরিবারটি আর্থিক সংকটের কারণে প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে না পারায় বৃটিশ আমলে নির্মিত সুন্দর এই নিদর্শনটি ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

২.১২. শ্রী শ্রী রাধা বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দির

কোটচাঁদপুরের আর একটি উলেণ্ঢখযোগ্য পারিবারিক মন্দির হল শ্রী শ্রী বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দির। কোটচাঁদপুর উপজেলার বলুহর ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ড এবং ৩৫ নং রামচন্দ্রপুর মৌজার রামচন্দ্রপুর গ্রামে বলুহর বাওড়ের উত্তরপাড়ে এর অবস্থান। বাংলা ১১১৫ সালে (মন্দিরের দেওয়ালে লিখিত তথ্য মতে) জমিদার কৃষ্ণলাল গোস্বামী মন্দিরটি প্রিতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে জমিদারবাড়িটি গোসাইবাড়ি নামে পরিচিত। কোটচাঁদপুরের বলুহর বাসস্ট্যান্ড হতে প্রায় ৩ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে গোসাইবাড়িটি অবস্থিত। মন্দিরটি নির্মাণে চুন-শুরকি ও পোড়ানো ইটের ব্যবহার করা হয়েছে এবং বারান্দা ও মূল ঘর- এ দু'ভাগে বিভক্ত। বারান্দ হতে ত্রিখিলান বিশিষ্ট প্রবেশ পথ দ্বারা মূল ঘরে প্রবেশ করতে হয়। আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে এই খিলানসমূহ নির্মাণ করা হয়েছে। খিলান বহুখাজ বিশিষ্ট এবং গোলায়িত জোড়া কোণদন্ড হতে উত্থিত। কোণদন্ডের নিম্নাংশ ফুলদানি আকৃতির খাজবিশিষ্ট করে নির্মিত। এর কার্ণিশ সমান্তরাল ও বহির্গত এবং কড়ি-বর্গার উপর টালির ছাদ নির্মাণ করা হয়েছে। মন্দির-অভ্যন্তরে পাথর এবং কাঠের তৈরী বিভিন্ন মাপের জগন্নাথ, বলরাম, শুভদ্রা, নিতাইগৌর ও রাধাকৃষ্ণ এবং নাড়ু গোপালের মূর্তি রয়েছে। ২০০২ খ্রি. এবং ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে কষ্ঠিপাথরের বৃন্দাবনচন্দ্রের দু'টি বিগ্রহ মূর্তি চুরি হয়ে যায়।

২.১৩. শ্রী কর্ণধার গোস্বামীর সমাধি-মন্দির

কোটচাঁদপুরের উল্লেখযোগ্য মন্দির হলে শ্রী কর্ণধার গোস্বামীর সমাধি-মন্দির। মূলত এটা সমাধিসৌধ হলেও মন্দির হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। ১৯৮৮ সালে নির্মিত এ মন্দিরের পুরাতাত্ত্বিক গুরূত্ব না থাকলেও সামাজিক গুর"ত্ব বিবেচনা করে উল্লেখ্য করা যায়। কোটচাঁদপুর উপজেলার কাগমারি গ্রামে বলুহর বাওড়ের উত্তরপাড়ে এক মনোরম পরিবেশে মন্দিরটি অবস্থিত। কাগমারী একটি প্রাচীন গ্রাম। পূর্বে এটা হিন্দু-প্রধান অঞ্চল ছিল এবং বেশিরভাগ লোক ছিল ঘোষ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। বর্তমানে প্রায় ৭০/৮০ ঘর হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এ গ্রামে বসবাস করে। ১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অনেক হিন্দু পরিবার ভারতে চলে যায়। যুদ্ধের অবসান হলে অনেক পরিবারই দেশে প্রত্যাবর্তন করে। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের দিকে শ্রী কর্ণধর গোস্বামী নিজস্ব খরচে এখানে প্রায় দু'বিঘা জমির উপর একটি আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন এবং তার একটি অংশ হিসেবে মন্দিরটি নির্মাণ করেন। তিনি দেহ ত্যাগ করলে এর মধ্যেই তাকে সমাহিত করা হয়। শ্রী গোস্বামীর স্ত্রী শ্রীমতি শিবুদাসী (৯০+) এখনো জীবীত আছেন। তাঁর কাছ থেকে জানা যায় যে, তার স্বামী, শ্রী গোস্বামী বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী ছিলেন এবং তিনি এ ধর্ম প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ষোড়শ শতকে শ্রী চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম এই অজপাড়াগায়েও যে বিস্তর লাভ করেছিল এবং তার ধারা যে আজও বিদ্যমান, মন্দিরটি তারই গুরুত্ব বহন করে।

মন্দিরের মূল কাঠামোটি বর্গাকার। বাহ্যিক পরিমাপ ১০.৮ফুট এবং অভ্যন্তরীণ পরিমাপ ৯.৮ ফুট। মূল কাঠামোটি পিরামিডাল আকৃতির। এর দেওয়াল প্রায় ৯ ফুট উপর থেকে ক্রমশ সরু হয়ে উপরে ঢালু হয়ে একটি বিন্দুতে মিলিত হয়ে এই পিরামিডাল আকৃতি ধারন করেছে। ক্রম প্রলম্বন পদ্ধতিতে এটা নির্মিত। উপরে ফিনিয়েল হিসেবে লোহার নির্মিত ত্রিফলা শোভা পাচ্ছে। মূল কাঠামোর চারপাশে ১০.৮" প্রশস্ত বারান্দা আছে। বারান্দার উপর সমতল ঢালাই ছাদ রয়েছে। সমস্ত মন্দিরের দেওয়াল পলেস্তারায় আবৃত এবং অলঙ্করণ বর্জিত। মন্দির অভ্যন্তরে শ্রী গোস্বামীর ব্যবহৃত পাঞ্জাবি,খড়ম, ঝাউ কাঠের ছড়ি সংরক্ষিত আছে।

উপসংহার ঃ

কোটচাঁদপুরের ধর্মীয় পুরাকীর্তি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যা একটি দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরতে প্রাচীন পুরাকৃর্তি ও প্রত্নসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বলা যায়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেশ-চেতনায় উজ্জীবিত করার একটি প্রধান উপায় হতে পারে তাদের নিজেদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। এ কাজে ইতিহাসের বস্তুগত উপাদানগুলো সংরক্ষণ করে নিজের শেকড় খোঁজার আয়োজন সম্পন্ন করা যায়। মনে হয় এর কোনো বিকল্প পথও নেই। জাতি হিসেবে আমাদের এ আয়োজন অকিঞ্চিৎকর। বঙ্কিমচন্দ্র একবার আক্ষেপ করে লিখেছিলেন বাঙালির কোনো ইতিহাস নেই। এ ক্ষেত্রে তিনি নিশ্চয়ই লিখিত ইতিহাসের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে একথাও সত্য যে, বাঙালির ইতিহাস লেখার জন্য যথোপুযুক্ত উপকরণের বড়ই অভাব। অথচ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মসজিদ-মন্দির-প্রসাদসহ প্রাচীন স্থাপনাসমূহ-ই হতে পারে বাঙালির ইতিহাসের অন্যতম উপকরণ। তাই আমাদের উচিৎ প্রাপ্ত অপর্যাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে সংরক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করে পর্যায়ক্রমে সকল প্রাচীন স্থাপনা ও পুরাকীর্তিসমূহ সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা করা। দেখা যায়, বেশ কিছু ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা ইতঃমধ্যে বেদখল হয়ে গেছে। কিন্তু এসব স্থাপনা-পুরাকীর্তির যথাযথ সংরক্ষণ, পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারলে তা কেবল ইতিহাস আর ঐতিহ্যের স্মারক হয়েই থাকত না, দেশী-বিদেশী পর্যটকদের নজর কারতে পারত। বাড়াতে পারত আমাদের জাতীয় রাজস্ব। শুধু কোটচাঁদপুর ধর্মীয় পুরাকীর্তি নয়, ঝিনাইদহ তথা সমগ্র দেশের পুরাকীর্তি সংরক্ষণের আয়োজন এখন সময়ের দাবী। বর্তমান সরকার ইতিমধ্যে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা খুবই নগন্য। প্রয়োজনে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনাশীপের মাধ্যমেও এর সংরক্ষণ ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমার বিশ্বাস প্রবন্ধটি দ্বারা সুধীমহল কোটচাঁদপুরের ধর্মীয় পুরাকীর্তি সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন এবং আরো গভীরতরভাবে গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ কোটচাঁদপুর ঝিনাইদহ জেলার একটি উপজেলা। জেলা-সদর থেকে প্রায় ২৯ কি.মি.দক্ষিণ-পশ্চিমে এর অবস্থান। এর আয়তন ১৬৫.৬৬ বর্গ কি.মি.। উত্তরে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা,দক্ষিণে মহেশপুর ও চৌগাছা উপজেলা, পূর্বে কালীগঞ্জ উপজেলা ,পশ্চিমে চুয়াডাঙ্গা সদর ও জীবণনগর উপজেলা। এ উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে চিত্রা নদী ও কপোতাক্ষ নদ। ১৮৬১-১৮৬৩ খ্রি. পর্যন্ত কোটচাঁদপুর যশোর জেলার ঝিনাইদহ সাবডিভিশনের অধিনে মহকুমা-সদর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোটচাঁদপুর থানা সৃষ্টি হয় ১৮৮৩ সালে এবং ১৯৮৩ সালে থানা থেকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয়। ইউনিয়ন ৫ টি, ওয়ার্ড ৯ টি, মৌজা ১১৪ টি এবং গ্রাম ৭৯ টি। ১৮৮৩ খ্রি. কোটচাঁদপুর মিউনিসিপালিটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭২ সালে Bangladesh Local Councils and Municipal Committee (Ammendment order, 1972 অনুযায়ী কোটচাঁদপুর পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। বি. দ্র. *Jessore district Gazetteer* (Dacca: Bangladesh government press, 1979) p. 295; *বাংলাপিডিয়া* ২য় খন্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪) পৃ.৪৭০; জনাব রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী কর্তৃক (সম্পা.) *ঐতিহ্যবাহী ঝিনাইদহ* (ঝিনাইদহ: জেলা প্রশাসন, ২০০৩) পৃ. ২৩০।

২ *বাংলাপিডিয়া*, ২য় খন্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪) পৃ. ৪৭১।

৩ *তদেব*, পৃ. ৪৭১।

৪ *তদেব*, পৃ.৪৭১।

৫ *বাংলাপিডিয়া*, ২য় খন্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪) পৃ. ৪৭০। কারো কারো মতে তার নাম চাঁদখা নয়; বরং চাঁদ সাহা এবং তিনি একজন হিন্দু সাধু ছিলেন এ বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়ন

৬ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পা. *শতাব্দী স্মরণে* (কোটচাঁদপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ২০০৬ খ্রি. প্রকাশিত) পৃ.৮; জনাব রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (সম্পা.) *ঐতিহ্যবাহী ঝিনাইদহ* (ঝিনাইদহ: জেলা প্রশাসন, ২০০৩) পৃ. ৩৩।

৭ এটা ফটিকমিয়া বা বুড়োপীর বা ফুলমিয়ার সমাধি বলেও এলাকার জনগনের মধ্যে মতভেদ আছে। তাঁর কথায় বৃষ্টি হতো বলে লোককাহিনী প্রচলিত আছে। তবে এটা যে সত্য নয় তা বলার অপেক্ষা রাখেনা ।

৮ শিবমন্দিরটি মহেশপুর থানা-সদর থেকে প্রায় ৩০০ গজ দক্ষিণ-পূর্বে দুলারী সিনেমা হলের পাশে অবস্থিত। ফুলমিয়া একজন দরবেশ ছিলেন। তিনি মধ্যএশিয়া বা আফগানিস্তান থেকে ধর্ম প্রচারের জন্য এ অঞ্চলে আগমন করেন এবং এখানে দরগাহ স্থাপন করেন বলে জানা যায়।

৯ ড. মো. আমিরুল ইসলাম ''বাংলাদেশের দু'টি অপ্রকাশিত মসজিদ: অবস্থান ও স্থাপত্যশৈলী'' *ইসলামী গবেষণা পত্রিকা*, ৪র্থ সংখ্যা, (রাজশাহী: সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ২০০৯) পৃ. ৯২-৯৩। প্রবন্ধকার নিজেও সরেজমিনে মসজিদটি পরিদর্শন করে এরুপ অলঙ্করণ দেখেছেন ।

১০ আতিয়ার রহমান ''চৌগাছার মন্দির: প্রাথমিক অনুসন্ধান ও আলোচনা" *ইতিহাস অনুসন্ধান*-১৬ (কলকাতা : ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড ,২০০২) পৃ. ৩৪৫ ।

১১ গবেষক ঢাকেশ্বরী মন্দির সরেজমিন পরিদর্শন করে এরুপ অলঙ্করণ দেখেছেন ।

১২ ড. মো. অমিরুল ইসলাম *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩ ।

১৩ জনাব রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (সম্পা.) *ঐতিহ্যবাহী ঝিনাইদহ* (ঝিনাইদহ: জেলা প্রশাসন, ২০০৩) পৃ. ৩৩।

১৪ *তদেব*।

১৫ কোটচাঁদপুর পৌরসভার সলেমানপুর সরদারপাড়া নিবাসী আবু তালেব মো. মুসা জমিদার বংশের লোক। ১৯শতকের প্রথমদিকে তাঁর পূর্বপুরূষরা গুজরাট হতে বাংলাদেশে চলে আসেন এবং ইংরেজদে অধিনে চাকরী গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে একটি মহালের দায়িত্ব পান। পরবর্তীতে তারা চাকরির পাশাপাশি কয়লার ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন।

১৬ আ ক ম যাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ* (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ ,২০০৭)পৃ. ৩৬৫।

১৭ জনাব রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (সম্পা.) *ঐতিহ্যবাহী ঝিনাইদহ* (ঝিনাইদহ: জেলা প্রশাসন, ২০০৩) পৃ. ২৫-২৬, ৩৩ ; সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুল্নার ইতিহাস* , ১ম খন্ড, (ঢাকা : লেখক সমবায় প্রকশ ২০০৬) পৃ. ২৭৪-২৭৮।

১৮ *বাংলাপিডিয়া*, ২য় খন্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ,২০০৪) পৃ. ৪৭১। এর মধ্যে কিছু মন্দির হলো-

ক. জগন্নাথ মন্দির

খ. মালাকার পাড়া দূর্গা মন্দির ।

গ. দুতিয়ারকুঠি কালী মন্দির ও লক্ষিকালীর আসন, দুতিয়ারকুঠি।

১৯ *তদেব*, পৃ. ৪৭১।

২০ আশ্রমের এই জমি গ্রাম ফান্ড কমিটি ইজারা প্রদান করে প্রাপ্ত অর্থ গ্রামের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে ব্যয় করে থাকে বলে জানা যায়।

২১ রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ*, ১ম খন্ড (কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৭ম সংস্করণ ১৯৯২) পৃ. ২৬৮।

২২ *বাংলাপিডিয়া* ২য় খন্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪) পৃ. ৪৭০ ।

২৩ *তদেব* ।

২৪ জনাব রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (সম্পা.) *ঐতিহ্যবাহী ঝিনাইদহ* (ঝিনাইদহ: জেলা প্রশাসন, ২০০৩) পৃ. ২৫-২৬, ৩৩।

২৫ *তদেব*, পৃ. ৩৩।

২৬ *বাংলাপিডিয়া*, ২য় খন্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪) পৃ. ৪৭০-৪৭১ ।

২৭ ড. মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, *সুলতানী আমলে মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ* (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯৬) পৃ. ২২।